সংবাদ
পরিষেবা | অক্টোবর ২০২২

কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক, এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম-ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

ভারতের অ-সার ব্যবস্থা

২৮/২০

দিল্লির সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (সিএসই) ভারতে জৈব সার নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। ২০১৫-১৬ এবং ২০১৮-১৯-এই সময়ের মধ্যে সারা ভারতে পরীক্ষিত মাটির তথ্যের সমীক্ষা করে এই রিপোর্ট তৈরি করেছে সংস্থাটি।

রিপোর্টিতে বলা হয়েছে, ভারতের মাটিতে মূলখাদ্য, অণুখাদ্য এবং জৈব কার্বনের অভাব রয়েছে। রাসায়নিক সারের ব্যাপক ব্যবহার মাটির এই প্রাকৃতিক পুষ্টির হ্রাসের প্রাথমিক কারণ। ২০১৯ সালে ভারত, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাসায়নিক সারের উৎপাদক এবং ব্যবহারকারী ছিল, যেখানে মোট ব্যবহৃত রাসায়নিক সারের প্রায় ৫০ শতাংশই ইউরিয়া। এই প্রেক্ষাপটে রিপোর্টটিতে জৈবসার ব্যবহারের উপকারিতাও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জৈবসারকে উপকারী অণুজীবের ব্যবহারের উপযোগী করে, বীজ, শিকড় বা মাটিতে যোগ করলে, মাটির স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হয়।

- জৈব সার হল উদ্ভিদ, প্রাণীর অংশ এবং বর্জ্য থেকে প্রাপ্ত পচনশীল জৈব উপাদান দিয়ে তৈরি পদার্থ। জৈব সারের উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সার, ভার্মিকম্পোট এবং শহরের আবর্জনা থেকে তৈরি কম্পোস্ট।
- দেশ জুড়ে পাঁচ কোটিরও বেশি মাটির নমুনার উপর করা পরীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতের মাটিতে নাইট্রোজেন, পটাসিয়াম এবং ফসফরাসের মতোই জৈব কার্বন এবং অণুখাদ্যের অনেক অভাব রয়েছে। তাদের পরীক্ষিত সমস্ত মাটির নমুনার মধ্যে ৯৭ শতাংশে নাইট্রোজেনের ঘাটতি ছিল, ৮৫ শতাংশে জৈব কার্বনের ঘাটতি ছিল, ৮৩ শতাংশে ফসফরাস এবং ৭১ শতাংশে পটাসিয়ামের ঘাটতি ছিল।
- ২০২০-২১ সালে ভারতের মোট রাসায়নিক সারের (সিঙ্গল সুপার ফসফেট বাদে) ব্যবহার হয়েছিল ৬২৯.৮ লক্ষ টন। আর প্রতি হেক্টর সার ব্যবহার হয়েছিল ১৬১ কিলোগ্রাম। যা ২০০০-২১ সালের সার ব্যবহারের থেকে মোট খরচের ৮২.৫ শতাংশ বেশি। এছাড়া ওই বছরের তুলনায় হেক্টর প্রতি ৭৫ শতাংশ বেশি রাসায়নিক সার ব্যবহার হয়েছে ২০২০-২১ বছরে।
- রিপোর্ট অনুসারে, হেক্টর প্রতি সবথেকে বেশি সার ব্যবহার করেছে, বিহার, পুদুচেরি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু,কর্নাটক, দিল্লি এবং উত্তরাখণ্ড।
- রিপোর্টটিতে রাসায়নিক সারের ওপর ক্রমবর্ধমান ভরতুকি উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২০-২১ বছরে রাসায়নিক সারের জন্য ভরতুকি দেওয়া হয়েছিল ১,৩১,২৩০ কোটি টাকা, ২০০০-২১ সালে যার পরিমাণ ছিল ১২,৯০৮ কোটি টাকা। আর ২০১৯-২০ বছরে এর পরিমাণ ছিল ৮৩,৪৬৮ কোটি টাকা।
- গবেষণায় দেখা গেছে, রাসায়নিক সার সময়ের সাথে ফসলের উপর কম কার্যকরী হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, সার প্রয়োগের সাথে সারের প্রতিক্রিয়ার অনুপাত (প্রতি কেজি সার প্রয়োগে উৎপাদিত শস্যের পরিমাণ কেজিতে) ১৯৭০ সালে ১৩.৪ থেকে ২০১৫ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ২.৭-এ।
- কোনো একটি বাহকের মাধ্যমে যে জৈবসার উৎপাদিত হয়, ২০২০-২১ বছরে সেই জৈবসার উৎপাদন হয়েছিল প্রায় ১,৩৪,৩২৩ টন, যা ২০১৮-১৯ বছরের তুলনায় ৮৩ শতাংশ বেড়েছিল। অন্যদিকে, ভারতে ২০২০-২১ বছরে তরল জৈবসারের উৎপাদন হয়েছিল ২৬,৪৪২ কিলোলিটার।

- রিপোর্টে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার দেশে জৈবসারের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য দুই ধরনের কর্মসূচি চালায়। এক্ষেত্রে চাষিদের লক্ষ্যে রেখে পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনা, ভারতীয় প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতি এবং জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা মিশন চালানো হয়। দ্বিতীয় ধরনের কর্মসূচির লক্ষ্য, উৎপাদক এবং বিপণনকারীরা। যার জন্য মূলধন বিনিয়োগ, ভরতুকি প্রকল্প এবং জাতীয় বায়োগ্যাস এবং জৈবসার কর্মসূচির মতো প্রকল্প চালানো হয়। রিপোর্টটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রয়োজনের তুলনায় উভয় ধরনের প্রকল্পে খুব কমই বিনিয়োগ করে সরকার। তাই প্রকল্পগুলির খুব একটা সফল হয়নি।
- দেশে জৈবসার তৈরি এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু প্রধান বাধা হল সরকারি তহবিল এবং ভরতুকি না থাকা। এছাড়া জৈবসারের গুণমান নিয়ন্ত্রণ এবং গবেষণার ক্ষেত্রে অনীহা, এর প্রসারে বাধার অন্যতম কারণ।
- জৈবসারের উৎপাদন ও ব্যবহার বাড়ানোর জন্য রিপোর্টটিতে একটি মোটা অঙ্কের তহবিল সহ জাতীয় কর্মসূচি ঘোষণার সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া এই সার নিয়ে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, গুণমান নিয়ন্ত্রণ, একে সহজলভ্য করার জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলিকে সুস্পষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা

২৮/২১

ফিনল্যান্ডর শিক্ষাব্যবস্থা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। শিক্ষায় আমেরিকা, ব্রিটেনকেও অনেক ক্ষেত্রে হার মানায় ফিনল্যান্ড। অথচ, সেখানকার ছকভাঙা ব্যবস্থায় ছোট থেকে বাচ্চারা স্কুলেই যায় না। ফিনল্যান্ডের শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয় ৭ বছর থেকে। তার আগে বাচ্চারা স্কুলেই যায় না। ছোটদের নার্সারি স্কুলের অস্তিত্ব অবশ্য ফিনল্যান্ডেও আছে, তবে সে সব স্কুলে লেখাপড়া নয়, বাচ্চারা খেলাধুলো করে।

ফিনল্যান্ডর মানুষ মনে করে, ৭ বছরের আগে শিশুদের মাথায় লেখাপড়া নিয়ে চাপ দেওয়া উচিত নয়। এদেশে ৭ বছরের কমবয়সী শিশুদের খেলাধুলোর মাধ্যমে তাদের সৃজনশীল সত্তার বিকাশ ঘটানো হয়। সমবয়সীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব, সকলে মিলেমিশে থাকা, একসঙ্গে কোনো গঠনমূলক কাজ করা – এ সবই হয় ছোটদের নার্সারি স্কুলে।

ফিনল্যান্ডে পড়ুয়াদের জন্য স্কুল কেবল ৯ বছর বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ, ৭ বছর বয়সে স্কুলে ঢুকে ১৬ বছরেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ হয়। ইচ্ছা করলে অবশ্য ১৬ বছর বয়সের পরও পড়ুয়ারা স্কুলে বা কলেজে উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যেতে পারে। তবে সবটাই ঐচ্ছিক।

এ দেশে কোথাও কোনো স্কুলে প্রথম ৬ বছর পরীক্ষা হয় না। শিশুদের মধ্যে কোনো প্রতিযোগিতার মনোভাবকে প্রশয় দেওয়া হয় না। ১৬ বছর বয়সে সকলকে ন্যাশনাল ম্যাট্রিকুলেশন এক্সামিনেশন নামে এক পরীক্ষায় বসতে হয়। ফিনিশীয়রা মনে করে, প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতাই সাফল্যের চাবিকাঠি। এ দেশে বেসরকারি স্কুলের কোনো অস্তিত্বই নেই।

সংবাদ মাধ্যমের তথ্য বলছে, পৃথিবীর সমস্ত স্কুলের পড়ুয়াদের চেয়ে কম সময় ক্লাস করে ফিনল্যান্ডের পড়ুয়ারা। তবু তাদের শিক্ষাগত পারদর্শিতা অনেক বেশি। এখানকার স্কুলগুলিতে মাত্র ৫ থেকে ৬ ঘন্টা ক্লাস হয়। ফিনিশীয় শিক্ষকরা পৃথিবীর যোগ্যতম এবং দক্ষতম শিক্ষকদের মধ্যে প্রথম সারিতে। স্কুলে টানা ৬ বছর ধরে পড়ুয়ারা একই শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকে। শিক্ষক বদল হয় না। এতে শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় হয়। একে ফিনল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ভ মনে করা হয়।

স্কুলে প্রথমেই বাচ্চারা ফিনিশ ভাষা শেখে। তারপর শেখানো হয় সুইডিশ এবং তৃতীয় ভাষা হিসেবে বাচ্চারা ১১ বছর বয়স থেকে ইংরেজি শিখতে শুরু করে। স্কুল শেষের পরীক্ষায় ইংরেজি থাকেই না। প্রথম দুই ভাষার পরীক্ষা হয়। এখানকার ৯৩ শতাংশ পড়ুয়া প্রতি বছর হাই স্কুল থেকে স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে বেরোয়। এদেশে নিরক্ষর কেউ নেই বললেই চলে। ইউনেস্কোর রিপোর্ট থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

সংবাদ পরিষেবা | অক্টোবর ২০২২

আত্মনির্ভর গ্রাম ও আজকের গ্রাম স্বরাজ

রিনচেন নরবু ওয়াংচুক

ষোলো আনা গ্রামসভার চেষ্টায় মদ, অনুন্নয়ন আর দারিদ্র মুছে মাত্র ৩ বছরেই সমৃদ্ধ ঝাড়খণ্ডের সিমারকুন্ডি, আরা ও কেরাম।

২৮/২২

গ্রামবাসীদের সঙ্গে সুনীল আর সিদ্ধার্থ ত্রিপাঠী

ভোর সাড়ে ৪ টে বাজল। প্রতিদিন এই ঘোষণায় ঘুম ভাঙে আরা আর কেরাম গ্রামের। ঝাড়খণ্ডের রাঁচি জেলার পাশাপাশি এই দুই গ্রামের জনসংখ্যা ৬০০। ঘুম থেকে ওঠার পর সবাই ১ ঘন্টা বাড়ি এবং গ্রাম পরিস্কার করে। আবর্জনা, বাঁশ দিয়ে তৈরি কুড়াদানে ফেলা হয়। এরপর তারা চাষের কাজ করতে মাঠে যায়। গ্রামেরই কয়েকজন যুবক-যুবতী বাচ্চাদের পড়তে বসায়। স্কুলে যাওয়ার আগে অবধি এই পড়াশোনা চলে।

একসময় অনুন্নয়ন, দারিদ্র আর মদের নেশায় জর্জরিত এই গ্রাম, আজ স্বনির্ভরতার উজ্জ্বল উদাহরণ। গ্রামের কাছাকাছি একটাই স্কুল। মাত্র দুজন প্যারা টিচার বা পার্শ্ব শিক্ষক এই স্কুল চালাত। সেটা ২০১৭ সাল। সেসময় দুটি গ্রামের লোক মিলে ঠিক করে, তারা আরো দুজন শিক্ষক নিয়োগ করবে। আর গ্রামবাসীদের চাঁদায় তাদের ৪ হাজার টাকা করে মাইনে দেবে। যেমন কথা তেমন কাজ। গ্রামেরই দুজন স্নাতককে নিয়োগ করা হয় স্কুলে।

ওই একই বছর, বাসিন্দারা, বিশেষ করে মহিলারা, একসাথে গ্রামে মদ খাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল মদই পরিবারগুলিকে সবদিক থেকে শেষ করে দিচ্ছে।

শুধু শিক্ষা বা সামাজিক বিষয় নয়, আর্থিক দিক থেকেও তো স্বাবলম্বী হতে হবে। চাষ এখানকার প্রধান জীবিকা। কিন্তু জলের অভাব। তাই জল ধরে রাখতে, মাটির তলার জল বাড়াতে আর মাটির ক্ষয় আটকাতে তারা ঠিক করলো ৭০০ টি চেকড্যাম বানাবে। ব্যস, গ্রামের ১৮০ জন শক্ত সমর্থ মানুষ লেগে পড়ল কাজে। ৭৫ দিন ধরে তারা অবিরাম পরিশ্রম করে তৈরি করে ফেলল চেকড্যাম। একাজে তাদের খরচ হল ১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। আর ১০০ দিনের কাজ, সরকারি প্রকল্প ছাড়াই তারা এই কাজ করেছিল গাঁটের পয়সা খরচ করে।

গত ৪ বছরের মধ্যে গ্রামের গড় আয় প্রায় পাঁচ গুণ বেড়েছে। চাষ ছাড়াও পশুপাখি পালনসহ আরো অনেক কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে। গ্রামে কয়েকটি খুচরো দোকানও শুরু হয়েছে। মাত্র ৪ বছরে কীভাবে সম্ভব হল এতসব কাজ!

এর উৎস হল, ষোল আনা গ্রামসভার পুনরুজ্জীবন। যেখানে এই গ্রাম দুটির সব পরিবারের মহিলা এবং পুরুষ একসঙ্গে বসে, তাদের উন্নয়নের জন্য আর্থিক, সামাজিক, অধিকার, সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। তর্ক-বিতর্ক করে। সিদ্ধান্ত নেয়। কে কোন কাজ করবে। খরচ কত হবে। টাকা কোথা থেকে আসবে। গ্রামের মানুষ কতটা শ্রমদান করবে, তা সবই ঠিক হয় এই গ্রামসভায়। সেই কারণে গ্রামসভাই এই কর্মযজ্ঞের প্রাণ ভোমরা।

আর যার অনুপ্রেরণায় গ্রামবাসীরা ২০১৭ সাল থেকে একজোট হতে শুরু করে, তিনি হলেন ফরেস্ট অফিসার সিদ্ধার্থ ত্রিপাঠী। বর্তমানে তিনি ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ১০০ দিনের কাজ বা এমজিএনআরএজিএ বিভাগের কমিশনার। প্রধানমন্ত্রী তাঁর 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানে এই গ্রাম দুটির সাফল্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন।

গ্রামবাসীদের সঙ্গে সিদ্ধার্থ ত্রিপাঠী আলোচনা করছেন

ঝাড়খণ্ডে গরিবি দূর করার খোঁজ

২০০১ সালে সিদ্ধার্থ ত্রিপাঠীর প্রথম পোস্টিং ছিল পশ্চিম সিংভূম জেলার চাইবাসায়। ফরেস্ট অফিসার হিসেবে সারাণ্ডার জঙ্গল ছিল তার কাজের এলাকা। টহলদারির সময় প্রথম তার পরিচয় হয় জঙ্গলের গ্রামগুলির নিদারুণ দারিদ্রের সঙ্গে। সেখানে ছিল না পানীয় জলের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষার আলো। ছিল না উপার্জনের কোনো ব্যবস্থা। কিন্তু কী করলে এই চরম দারিদ্র দূর করা যায়, তার কোনো কিছুই জানা ছিল না ত্রিপাঠীর। এরপর তিনি বদলি হয়ে যান হাজারীবাগে। দুই জায়গাতেই তিনি গ্রাম উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিষেবা-জঙ্গলে থাকা গ্রামগুলিতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ২০০৪ সালে তিনি কোডারমাতে ডিএফও বা বিভাগীয় বন অধিকর্তা হিসেবে যোগ দেন। এখানে সরকারের সাহায্য ছাড়া গ্রামগুলি কীভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে তা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেন। এসব নিয়ে তিনি যখন অন্য অফিসার বা বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আলোচনা করতেন-তখন তারা বলত 'ইতনে সারে গান্ধী কাঁহা সে আয়েঙ্গে' (এত গান্ধী কোথা থেকে আসবে)।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গ্রামে পথে

ব্যর্থ পরীক্ষা

তিনি প্রথম যে গ্রামটি পরিদর্শন করেছিলেন তা হল চৌরাহী। যেটি ছিল খনিজ অভ্র বা মাইকা সমৃদ্ধ ঝুমরি তালাইয়া জেলা সদর থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে। এই গ্রামের বাসিন্দাদের সঙ্গে উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করতে প্রতি সপ্তাহের শেষে একবার গ্রামটিতে যেতেন। গ্রামে ছিল ৩৫টি পরিবার। প্রথম ছয় মাসে এখানে কয়েকটি সেচ কুয়ো তৈরি এবং চাষের কাজ হবে বলে গ্রামবাসীরাই ঠিক করেন। কিন্তু কাজ প্রায় কিছুই করা যায়নি। গ্রামবাসীদের মদের নেশা এর অন্যতম কারণ।

এখানে প্রতিটিপরিবার অবৈধভাবে মদ তৈরি করত, খেত আর বিক্রির জন্য নিয়ে যেত ঝুমরি তালাইয়াতে। কোনো ফল না পেয়ে তিনি কাজ বন্ধ করে দেন। এরপর ধাব বলে একটি গ্রামে তিনি গ্রামসভা পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেন। নকশাল অধ্যুসিত এই গ্রামে ২০০০ টি পরিবার বাস করত। এই গ্রামেরও আশেপাশে ছিল অভ্র মাইকার খনি। এখানে পরবর্তী দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে গ্রাম পুনর্গঠনের কাজ করেন। সেখানে গ্রামসভায় গ্রামের সমস্যা নিয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। মদ নিষিদ্ধ করেছিল গ্রামসভা। স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজও শুরু হয়েছিল। কিন্তু গ্রামেরই উচ্চবর্ণের লোকেরা একজন যুবককে নৃশংসভাবে খুন করার ফলে, সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। উচ্চবর্ণের এক যুবতীর সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ায় তাকে খুন হতে হয়। সেসময় পুলিশের ভয়ে অনেকে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় বিষন্ন সিদ্ধার্থ তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষা বন্ধ করতে বাধ্য হন।

গ্রামবাসীদের সঙ্গে সিদ্ধার্থ ত্রিপাঠী

সাফল্য, অবশেষে

পরে তিনি ১৮০০ একর জঙ্গলে ঘেরা সেমারকুন্ডি নামের এক আদিবাসী গ্রামের খোঁজ পান। এই গ্রামে সাইকেলেও যাওয়ার পথ ছিল না। ঘন জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে ৭ কিলোমিটার হেঁটে যেতে হত। গ্রামবাসীরা পাথর খাদানে বা অবৈধ কাঠ কাটার কাজ করত। এই গ্রামটিও ছিল নকশাল অধ্যুসিত। এদের জন্য বরাদ্দ দেড় লাখ টাকা খরচ হয়নি বলে সরকারি আধিকারিকেরা সিদ্ধার্থকে বারবার জানাচ্ছিলেন। সেজন্য স্থানীয় রেঞ্জ অফিসারকে তিনি বলেন, গ্রামটিতে গিয়ে জানতে যে, তাদের কী দরকার।

রেঞ্জ অফিসার গ্রামটি ঘুরে এসে বলেন, তাদের এখনই দরকার একটি পানীয় জলের কুয়ো। কারণ গ্রামে পানীয় জলের অভাব। অনেকে দূর থেকে, শুকনো নদীর বালি খুঁড়ে তাদের পানীয় জল আনতে হয়। এরপর স্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে, ৭৮ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি ৩০ ফুট গভীর পানীয় জলের কুয়ো তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়। এই কাজের অগ্রগতি কতটা হল তা দেখতে সিদ্ধার্থ ২০০৬ সালের জানুয়ারিতে হেঁটে প্রথমবার এই গ্রামে যান।

তিনি দেখেন, কুয়োটির কাজ প্রায় শেষ। আর খুব ভালো করে কাজটি করা হয়েছিল। সিদ্ধার্থ লক্ষ্য করেন, গ্রামটির বাসিন্দারা

সবাই একই জাতের। তখন তাঁর মনে হয় যে, গ্রামটিতে পুনর্গঠনের কাজ করা সম্ভব। পরে খুবই দ্রুত কুয়ো তৈরির কাজ শেষ হয়। এরপর থেকে প্রতি রবিবার সিদ্ধার্থ গ্রামটিতে যেতেন। এভাবে প্রায় ৪০ বার তিনি গ্রামে গিয়েছিলেন। কয়েক মাস পরে গ্রামবাসীরা সিদ্ধান্ত নিয়ে যাতায়াতের রাস্তাটি মেরামত করে। তখন থেকে সিদ্ধার্থ মোটর সাইকেলে যেতে শুরু করেন। সিদ্ধার্থ বলেছিলেন, এখন গাড়ি নিয়ে গ্রামে যাওয়া যায়।

তাঁর পরামর্শে এবং গ্রামবাসীদের সদিচ্ছায় ৬ মাসের মধ্যে, নিয়মিত গ্রামসভা বসতে শুরু করে সিমারকুন্ডিতে। যেখানে সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা স্বেচ্ছায় মদ খাওয়া বন্ধ করে। সিদ্ধার্থ যখন প্রথম গ্রামে যান, সে সময়ে ৩৫ একর চাষের জমি থেকে বছরে আয় হত ২০ হাজার টাকা। বর্তমানে তারা ৪৭ লাখ টাকা উপার্জন করে কৃষিকাজ এবং পশুপালন করে। আগে যেখানে পানীয় জলের অভাব ছিল, সেখানে এখন গ্রামে সব জমিতে সেচ দেওয়ার মত জল রয়েছে।

এখানে চাষের কাজে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। তারা বন থেকে কাঠ না কেটে গাছে রাখি পরায়। নিকাশি ও পয়ঃ ব্যবস্থা ভালো হয়েছে। নিয়মিত আবর্জনা পরিষ্কার করা হচ্ছে। প্রতিটি পরিবার, পরিবার পরিকল্পনায় অংশ নিয়েছে। পারিবারিক হিংসা, ছোট বয়সে বিয়ে বন্ধ হয়েছে। এগুলি না মানলে শাস্তির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। গ্রামের মানুষদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে নিজেরাই চওড়া কাঁচা রাস্তা তৈরি করেছে। ভারি বৃষ্টি হলে বা অন্য কারণে রাস্তা খারাপ হলে, গ্রামবাসীরাই তা মেরামত করে নেয়।

গ্রামের মহিলাদের সঙ্গে আলোচনা

মডেল

মডেলটি কীভাবে সফল হল? এ প্রশ্নে সিদ্ধার্থ জানান –

গ্রামে সময় বিনিয়োগ ঃ কর্মকর্তারা শুধুমাত্র দিল্লি, জেলা বা ব্লক সদরে বসে থাকলে কোনো পরিবর্তন হবে না। গ্রামবাসীদের সঙ্গে একাত্ম হতে, তাদের চাহিদা বুঝতে গ্রামে নিয়মিত যেতে হবে। আরা, কেরাম এবং সিমারকুন্ডিতে সিদ্ধার্থ প্রতি সপ্তাহে একবার যেতেন।

নিয়মিত খোলো আনা গ্রামসভা : ভারতের সাড়ে ৬ লক্ষ গ্রামের মধ্যে, খুব কম গ্রামেই সত্যি অর্থে নিয়মিতভাবে গ্রামসভা বসে। ফলে গ্রামবাসীরা তাদের সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা বা আলোচনা করে না। গ্রামসভা নিয়মিত বসলে নিজেদের অনেক সমস্যা সহজেই সমাধান করা সম্ভব। এই গ্রামগুলিতে সপ্তাহে একবার গ্রামসভা বসে।

লোক শিক্ষা : মানুষের জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে সম্মান করা খুবই দরকার। নিজেদের চিন্তা বা আদর্শ তাদের ওপর চাপানো উচিত নয়। গ্রামবাসীরা যা জানেন তা থেকে শুরু হোক। এতে তারা তাদের ক্ষমতা এবং শক্তি নিজেরাই বুঝতে পারবে। আত্মবিশ্বাসী হবে। একবার বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হলে, তাদের চাহিদা মতো কিছু সহায়তা করা যেতে পারে। এই গ্রামগুলিতে সপ্তাহে একবার গ্রামসভা বসে। এই সহায়তা তখন তারা সহজেই গ্রহণ করবে বলে সিদ্ধার্থ জানান। তাঁর মতে, লোক শিক্ষার কাজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি প্রথমেই ধরা উচিত। যেমনটি করেছে এই গ্রামের মানুষেরা।

পরিচ্ছন্নতা অভিযানে বাসিন্দাদের জড়িত করার প্রভাব খুব তাড়াতাড়ি দেখা যায়। এই অভিযানকে সিদ্ধার্থ ৫ ভাগে ভাগ করেন — গ্রামের রাস্তা এবং মাঠ বরাবর ঝোপঝাড় পরিষ্কার। প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ। নোংরা জলকে শোধন করে ফের ব্যবহার। বাসস্থান থেকে দূরে, জৈব আবর্জনা দিয়ে কম্পোস্ট পিট তৈরি। আর খোলা জায়গায় মলত্যাগ বন্ধ করার জন্য স্যানিটেশন বা পয়ঃ ব্যবস্থার সুবিধা নিশ্চিত করা।

সিদ্ধার্থ বলেন, 'টানা ১০ দিন সবাই মিলে পরিচ্ছন্নতার এইসব কাজ করতে পারলে তারা তাদের নিজের গ্রামকেই চিনতে পারবে না। দেখা যাবে ঝোপঝাড় পরিষ্কার করায় রাস্তা চওড়া হয়েছে। মাঠ হয়েছে ঝোপঝাড় মুক্ত। সমস্ত প্লাস্টিক কুড়াদানে জমা হয়েছে। এসব কাজের প্রভাব এত দ্রুত যে তা গ্রামবাসীদের আত্মবিশ্বাস তৈরি করে'।

এখন শ্রমদানের ঐতিহ্য গ্রাম থেকে হারিয়ে গেছে। শ্রমদানের মাধ্যমেই গ্রামবাসীদের নিজেদের প্রতি আস্থা তৈরি হয়। নিজেদের গ্রামের মর্যাদা, গর্ব এবং মালিকানার বোধ জেগে ওঠে। লোকশিক্ষার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তাদের মতামত এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে তাদের জ্ঞানকে সবথেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া। এটা কখনই কাম্য নয় যে, বেঁচে থাকার জন্য তারা পুরোপুরি সরকারের উপর নির্ভরশীল হয়ে ভিখারি হয়ে যাক। সিদ্ধার্থের মতে, এভাবে দুই-তিন মাস কাজ করলে, গ্রামের পরিবেশ বদলে যেতে শুরু করে। লোকেরা একসঙ্গে কাজ করে। জোট বাঁধতে শুরু করে।

সিদ্ধার্থ মনে করেন, ক্রমশ গ্রামবাসীদের আস্থা এবং গ্রামের প্রতি নিজেদের মালিকানা বোধ তৈরি হলে, খুবই ভালোভাবে ১০০ দিনের কাজের মত প্রকল্পগুলি ব্যবহৃত হয়। গ্রামবাসী সম্পূর্ণ নিজেদের দায়িত্বে খাল খনন, বৃষ্টির জল ধরার জন্য কাঠামো, চেক ড্যাম নির্মাণ, গবাদি পশুর থাকার জায়গা তৈরিসহ যে কোনো উন্নয়ন কাজ সহজেই করতে পারে।

গ্রামবাসীদের নিয়ে নিয়মিত গ্রামসভা

আরা ও কেরামের সাফল্য

সিদ্ধার্থ বলেন, তিনি আরা ও কেরামের কাজ শুরু করেছিলেন সামাজিক সমস্যা দিয়ে। এজন্য অপরিহার্য হল প্রতি সপ্তাহে একবার গ্রামসভার মিটিং। এই মিটিং -এ গ্রামের প্রত্যেক পুরুষ, মহিলা সবাই উপস্থিত থাকত। সেখানে গ্রামের সমস্যা ও তা সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা হত। যে কাজগুলি বাইরের সাহায্য ছাড়াই করা যায়, সেগুলিই গ্রামসভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে গ্রামবাসীরা প্রথমে শুরু করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, গ্রামকে মদ মুক্ত করা, সমস্ত ধরনের পরিচ্ছন্নতা, পরিবার পরিকল্পনা, কম বয়সে বিয়ে বন্ধ, শিশু শ্রম বন্ধ, অল্পবয়সী মেয়েদের শিক্ষা, পারিবারিক হিংসা এবং কুসংস্কার দূর করা ইত্যাদি। এই সমস্যাগুলি সমাধানের পর, গ্রামসভা স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জীবিকা, জল, বন এবং কৃষি-সম্পর্কীত বিষয়গুলি নিয়ে কাজ শুরু করে।

সিদ্ধার্থ ত্রিপাঠীর সহযোগী সুনীল শর্মা বলেন, 'স্যার আমাকে প্রথম যে জিনিসটি বলেছিলেন তা হল, আরা ও কেরামের গ্রামবাসীদের সাথে সময় কাটানো, তাদের সাথে দেখা করা, কথা বলা, তাদের দৈনন্দিন জীবন, তাদের পছন্দ-অপছন্দ এবং তাদের সামাজিক কাঠামো, সংস্কৃতি, পরিবেশ এবং প্রতিবেশকে বোঝা। তাদের কথা শোনার পর আমরা তাদের কাজে কীভাবে সহায়তা করতে পারি সেসব গ্রামবাসীদের বলেছিলাম'।

সুনীল বলেন, সামাজিক সমস্যাগুলি সমাধানের পর গ্রামসভা বসেছিল ১০০ দিনের কাজে প্রকল্পের মাধ্যমে কী করা যায় তা নিয়ে। সেখানে ঠিক হয় রাস্তা, পানীয় জলের কুয়ো, খাল, গবাদি পশুর চালা, চেক-ড্যাম ইত্যাদি করা হবে এই প্রকল্পের মাধ্যমে। এরপর একবছরের মধ্যে তারা গ্রামে জল ও মাটি সংরক্ষণ, বৃষ্টির জল সংগ্রহ এবং গবাদি পশুর চালা ইত্যাদি করে ফেলতে সমর্থ হয়। এছাড়া আয় বাড়ানোর জন্য গ্রামবাসীরা হাঁস-মুরগি, ছাগল পালন এবং মাছচাষও শুরু করেছিল।

২০১৭-১৮ সালে, বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য যেসব কাজ হয়েছিল, তাতে মাটির তলার জলের পরিমাণ বেড়েছিল। কৃষি বিভাগের প্রকল্পের মাধ্যমে বিন্দু সেচের (বা ড্রিপ ইরিগেশনের) ব্যবস্থা হয়েছিল ফলে তারা অনেক বেশি জমিতে সেচের ব্যবস্থা করতে পেরেছিল। এখন আরা ও কেরামের ৬০ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা রয়েছে। এক ফসলি জমিতে এখন তিনবার চাষ হচ্ছে। পরের বছর, ফাঁকা বনের জমিতে তার শ্রমদান করে ৭০০ টি চেক-ড্যাম তৈরি করে চারা রোপণ করে। একসময় পরিবার

উন্নয়নের কাজ

পিছু মাসে ৩ হাজার টাকা আয় করতে তাদের কালঘাম ছুটে যেত। এখন তারা মাসে গড়ে প্রায় ১৫ হাজার টাকা আয় করে। গ্রামবাসী রমেশ বেদিয়া বলেন, আগে তিনি শুধু চাষ করতেন। আর এখন চাষের সঙ্গে গবাদি পশুপালন করেন। নিয়মিত দুধও বিক্রি করেন।

আরা ও কেরাম গ্রামের প্রধান গোপাল বেদিয়া বলেন, 'গ্রামসভাকে একজোট করতে শ্রমদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ত্রিপাঠী স্যার আমাদের ''বন রক্ষা বন্ধন'' (গাছের সাথে পবিত্র সুতো বেঁধে, তাদের রক্ষা করার শপথ নেওয়ার) আয়োজন করতে বলেছিলেন। তিনি আমাদের তামাক এবং মদ ছাড়তে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এইসব বাজে খরচ না করার জন্য আমাদের পয়সা বাঁচত। এই পয়সা আমরা অন্য উপার্জনের কাজে বিনিয়োগ করেছিলাম। এর পরে আর আমাদের পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি'।

গ্রামবাসীরা যদি একজোট হয়ে তাদের উন্নয়ন করতে চায়, তবে তাদের কাছে সব অসম্ভব কাজই করা সম্ভব। আরা ও কেরাম তার উজ্জ্বল উদাহরণ। সাধারণ মানুষের সহযোগিতা ছাড়া সরকারের কোনো পরিকল্পনাই সফল হতে পারে না। সরকার শুধুমাত্র ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প, মাছ ও হাঁস-মুরগি পালনের মতো জীবিকার সুযোগগুলি গ্রামবাসীদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। গ্রামের লোকেরাই সেগুলি রূপায়ণ করেছে। নিজেদের আয় বাড়িয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে রাঁচির প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনার মনোজ কুমার একথা বলেন।

চেক ড্যাম

মডেলটির প্রসার

সিমারকুন্ডি, আরা এবং কেরাম সফল স্বনির্ভর গ্রামে পরিণত হয়েছিল মাত্র ৩ বছরে। এই সাফল্যে ঝাড়খণ্ড সরকার দীনদয়াল গ্রাম স্বাবলম্বন যোজনায়, খুন্তি জেলার সমস্ত গ্রামে, এই মডেলটি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। আর সিদ্ধার্থ ত্রিপাঠীকে একাজে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে মোট ৮০টি গ্রামে কাজ শুরু হয়। ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচন এবং কোভিড অতিমারি সত্ত্বেও প্রায় ৩৫টি গ্রাম, আরা এবং কেরামে দেখানো পথে প্রায় ৮০ শতাংশ সফল হয়েছে বলে সিদ্ধার্থ ত্রিপাঠী জানান।

এই মডেলের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল স্থানীয় মহিলাদের গ্রামবাসীদের একজোট করার কাজ দেওয়া। তিনটি গ্রামের কাজ করার সময় সিদ্ধার্থ দেখেছিলেন, মহিলারাই মদ বন্ধ, পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং উন্নয়নমূলক কাজে সবার আগে এগিয়ে এসেছিল। আর দায়িত্ব নিয়ে কাজও করেছিল।

সুনীল বলেন, 'এই কাজের জন্য আমরা নির্দিষ্ট বা আশেপাশের জেলা থেকে উৎসাহী এবং উদ্যোগী মহিলাদের বাছাই করি। যাদের 'লোক প্রেরক' বলা হয়। আমরা তাদের নির্দিষ্ট কয়েকটি নিয়ম ধরে নির্বাচন করি। যেমন, যারা বাড়ি থেকে কয়েক সপ্তাহ দূরে কাটাতে ইচ্ছুক। মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারে। হিন্দি বা স্থানীয় উপভাষায় কথা বলতে পারে-ইত্যাদি। আর যে মায়েরা এখনও বাচ্চাকে নিজের দুধ খাওয়ায়, তাদের নিয়োগ করা হয় না। প্রথমে প্রায় ১০ দিনের জন্য, এই মেয়েদের ব্লক স্তরে গ্রামের জনসংখ্যার গড়ন, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সম্পদ, গ্রামবাসীদের একজোট করার কৌশল ইত্যাদি নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়'।

এরপর তাদের, দায়িত্বে থাকা গ্রামে চার সপ্তাহ কাটাতে হয়। পরে তারা বাড়িতে ফিরে যায়। কিছুদিন পর আবার ব্লক স্তরে প্রশিক্ষণ হয়। সেখানে প্রথমে গ্রামগুলি থেকে তারা চার সপ্তাহে কী শিখেছে, জেনেছে, বুঝেছে সেগুলি সবার সামনে তুলে ধরে। এর ওপর ভিত্তি করে আরো ৫ দিনের একটি প্রশিক্ষণ হয়।

লোক প্রেরকের দুজনকে একসাথে ৪টি গ্রামের একটি গুচ্ছ বা ক্লাস্টারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। মূলত, সিদ্ধার্থ এবং সুনীল সিমারকুন্ডিতে, আরা ও কেরামে যে কাজটি করেছিলেন – মেয়েরা গ্রামগুলিতে সেই কাজ করে। তারা গ্রামের অন্যান্য মহিলা, কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে খুবই ভালোভাবে মিশতে পারে। তারা ধীরে ধীরে, গ্রামসভা সংগঠিত করতে শুরু করে। লোকেদেরকে সাপ্তাহিক বৈঠকে যোগ দিতে এবং তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে উৎসাহিত করে। এদের অনেকেই শুধু মাধ্যমিক পাশ। কিন্তু গ্রামসভাগুলিতে একজোট করার কাজে তারা খুবই পারদর্শী।

উন্নয়নের কাজ

সিদ্ধার্থ বলেন, 'আমি সপ্তাহে একবার গ্রামে যেতাম। আর এরা রাতদিন ২৪ ঘন্টা গ্রামে থাকে। এখন অনেক গ্রামই মদমুক্ত হয়েছে এই মেয়েদের এবং গ্রামবাসীদের উদ্যোগে'। তিনি আরো জানান, 'আপনি যখন তাদের উন্নয়নে সত্যিকার অর্থে বিনিয়োগ করেন, তখন বাসিন্দারা আপনাকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। আপনার সঙ্গে কাজ করতে উৎসাহী হয়'।

সিদ্ধার্থ ত্রিপাঠী জানান, এই তিনটি গ্রামে যে মডেলটি তৈরি হয়েছে, তাতে দেখা গেছে কমবেশি আড়াই বছরে একটি গ্রাম দারিদ্রমুক্ত হতে পারে। আর তাদের যৌথ আয় ৫ গুণ অবধি বাড়াতে পারে। এই কাজ শুধু ঝাড়খণ্ডে নয়, ভারতের অন্যান্য গ্রামেরও উন্নতি করতে পারে।

ভাষানুবাদ ঃ সুব্রত কুণ্ডু | নিবন্ধটি দ্য বেটার ইন্ডিয়া ৩০ জুলাই ২০২০-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা - ৭০০ ০৪২ । দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুণ্ডু